২

ক্রান্তিকালীন বিশ্ব, সাংগঠনিক কাঠামো ও ক্ষতিপূরণ আইনসমূহ

A World in Transition, Orgazizational sturucture and Compensation Legislation

ভূমিকা

ক্রান্তিকালীন বিশ্বে কোনো রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে একধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তখন বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্রই সাধারণত সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই অবস্থায় পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হয়। তখন রাষ্ট্র বা সংগঠন তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ বিশেষ কৌশল গ্রহণ করে। সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অন্যতম উপায় হলো সংগঠন। কারণ কর্মীর কার্য সম্পাদনের বিবরণ ও জবাবদিহির চিত্র থাকে সাংগঠনিক কাঠামোয়। শ্রমিক কর্মীর স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি মজুরি ও বেতনের ধরন ও পরিমাণ কেমন হবে তা সংগঠন কাঠামোর উপর নির্ভর করে। প্রাচীনকালে বেতন ও মজুরি আইন ছিল সাধারণ। বর্তমানে সভ্যতা বিকাশের ফলে কর্মীদের শ্রমঘন্টা নির্ধারিত হয়েছে। সাপ্তাহিক ছুটির ব্যবস্থা হয়েছে। যার ফলে তারা পুনরায় শারীরিক শক্তি ফিরে পায়। তারা সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারে। এ ইউনিটে আমরা ক্রান্তিকালীন বিশ্ব, সাংগঠনিক কাঠামো ও ক্ষতিপূরণ আইনসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব। তাহলে আসুন, ইউনিটটি শেষ করি এবং ক্রান্তিকালীন বিশ্ব, সাংগঠনিক কাঠামো ও ক্ষতিপূরণ আইনসমূহ আয়ত্ত করি।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি
পাঠ-২.২ : ক্রান্তিকালীন বিশ্ব ও ক্ষতিপূরণের অর্থনৈতিক তত্ত্ব
পাঠ-২.৩ : প্রণোদনামূলক মজুরি
পাঠ-২.৪ : সাংগঠনিক কাঠামো
পাঠ-২.৫ : ক্ষতিপূরণ আইনসমূহ

পাঠ-২.১ ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি
Compensation Programme

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি সংজ্ঞায়িত করতে পারবেন।
- বেতন ও মজুরির পার্থক্য ও মজুরির হার নির্ধারণ করতে পারবেন।

ক্ষতিপূরণ কর্মসূচির সংজ্ঞা
(Definition of Compensation Programme)

কর্মীকে তার কাজের বিনিময়ে যা দেওয়া হয় তাকে ক্ষতিপূরণ বলে। এজন্য প্রতিষ্ঠানের যে কর্মসূচি থাকে তাকে ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি বলে। ক্ষতিপূরণ কর্মসূচিতে শ্রমিক কর্মচারীদের যখন কাজ থাকে না, তখন বিভিন্ন সেবা ও সুবিধাসমূহ প্রদান করা হয়। যদি কোনো কারণে কর্মী বরখাস্ত হয়, অসুস্থ বা দুর্ঘটনার জন্য কাজ করতে অক্ষম হয়, তখন চিকিৎসার জন্য অর্থ পরিশোধ করা হয়। অবসর গ্রহণের জন্য পেনশন পরিশোধ করা হয়। কর্মীদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করলেও অর্থ পরিশোধ করা হয় এবং আরও অনেক সেবা ও সুবিধাসমূহ প্রদান করা হয়। যেমন– কোম্পানির গাড়ি, বিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতি নিশ্চিত করা হয়। এ সকল ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনধারাকে প্রভাবিত করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ক্ষতিপূরণ কর্মসূচি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন– মহার্ঘভাতা, বিশেষ বেতন, বিনোদন ভাতা, কমিশন, দায়িত্ব ভাতা ও শিক্ষা সহায়ক ভাতা ইত্যাদি।

বেতন ও মজুরির পার্থক্য
Difference between Salaries and Wages

বেতন ও মজুরি দুটিই আর্থিকরূপে প্রদান করা হয়। তবে এদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে যা নিম্নরূপ :

ক্রমিক	বিষয়	বেতন	মজুরি
১	সংজ্ঞা	উৎপাদনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত নয়, এই ধরনের পারিশ্রমিক হলো বেতন	উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত সেই ধরনের পারিশ্রমিককে মজুরি বলে।
২	পরিশোধের সময়	বেতন মাসিক, ত্রৈমাসিক বা বার্ষিক হিসেবে প্রদান করা হয়।	মজুরি ঘণ্টা, দৈনিক, সাপ্তাহিক হিসেবে দেওয়া হয়।
৩	শ্রমভিত্তিক	বেতনভুক্ত কর্মীরা মানসিক শ্রম বিনিয়োগ করে থাকে।	মজুরিভিত্তিক কর্মীরা বেশির ভাগ কায়িক পরিশ্রম করে।
৪	স্থায়ী/অস্থায়ী	যাদের বেতন হিসেবে রাখা হয় তাদের চাকরিকাল স্থায়ী হয়ে থাকে।	যাদের মজুরি ভিত্তিতে কাজ দেওয়া হয় তাদের কর্মকাল অস্থায়ী হয়ে থাকে।
৫	কর্মসংস্থান	বেতনভুক্ত কর্মীরা বেশির ভাগ অফিসের অভ্যন্তরীণ কাজ করে।	মজুরিভুক্ত কর্মীরা উৎপাদনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত।
৬	গুরুত্ব বা মর্যাদা	বেতনভুক্ত কর্মীদের গুরুত্ব বা মর্যাদা অনেক বেশি।	মজুরিভুক্ত কর্মীদের বেতনভুক্ত কর্মীদের চাইতে মর্যাদা কম।
৭	পারিশ্রমিক নির্ধারণ	যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা বিবেচনা করে বেতন নির্ধারণ করা হয়।	কাজ, সময়, কায়িক শ্রম বিবেচনা করে মজুরি প্রদান করা হয়।
৮	ওভারটাইম	যারা বেতনভুক্ত কর্মী তারা অনেক ক্ষেত্রে ওভারটাইমের অর্থ পায় না।	মজুরিভুক্ত কর্মীরা নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অতিরিক্ত সময় কাজ করলে ওভারটাইম পেয়ে থাকে।

পরিশেষে বলা যায় যে, বেতন ও মজুরির পার্থক্য থাকলেও অনেকেই দুটিকে একই জিনিস বলে মনে করেন।

বেতন ও মজুরির হার নির্ধারণ
Determining Rates of Pay

মজুরি ও বেতনের হার নির্ধারণ করা অত্যন্ত জটিল। সকল শ্রমিক কর্মীদের মজুরি সমান নয়। কর্মীদের জ্ঞান, দক্ষতা, পদোন্নতি অনুযায়ী কাজও বিভিন্ন ধরনের এবং তাদের বেতনও বিভিন্ন পরিমাণের হয়ে থাকে। নিম্নে মজুরি হারের নির্ধারণসমূহ আলোচনা করা হলো :

১। **জ্ঞান ও দক্ষতার ধরন (Kinds of knowledge and skill) :** প্রত্যেক শ্রমিক কর্মীর জ্ঞান ও দক্ষতা বিভিন্ন ধরনের। যার যত বেশি জ্ঞান, যে যত বেশি দক্ষ তার উপর নির্ভর করে মজুরির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। এছাড়াও কর্ম পরিবেশ, ঝুঁকি কর্মপ্রচেষ্টা এমনকি জ্যেষ্ঠতাও বেতন ও মজুরি হারকে প্রভাবিত করে।

২। **ব্যবসায়ের ধরন (Kinds of business) :** ব্যবসায়টি সরকারি বা বেসরকারি হতে পারে। বেসরকারি খাতের কোম্পানিতে বেতন ও মজুরি বেশি হয়ে থাকে। আবার সরকারি-বেসরকারি যা-ই হোক না কেন, কিছু ক্ষেত্রে বেতন ও মজুরি কম, আবার কিছু ক্ষেত্রে বেশি। যেমন– রেস্টুরেন্ট, আবাসিক হোটেল, খুচরা ব্যবসায়ে কর্মরত শ্রমিক কর্মীদের বেতন ও মজুরির হার কম। আবার পরিবহন, খনি ও ভারী উৎপাদনের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি। কিন্তু বস্ত্র ও পোশাক খাতে শ্রমিক কর্মীদের বেতন ও মজুরি হয় কম।

৩। **সংঘ ও অসংঘ মর্যাদা (Union-Non union status) :** সংঘ ও অসংঘ কর্মীদের উপরও মজুরির হার নির্ধারণ নির্ভর করে। একজন সংঘ কর্মী যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পায় একজন অসংঘ কর্মী তা নাও পেতে পারে।

৪। **মূলধনমুখিতা বনাম শ্রমিকমুখিতা (Capital intensive versus labour intensive) :** মূলধননির্ভর কোম্পানিসমূহে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার হয়। ফলে তাদের মজুরি বা বেতন বেশি হয়। আর শ্রমনির্ভর কোম্পানিতে অদক্ষ কর্মীদের উপস্থিতি বেশি। ফলে কর্মী সংখ্যা বেশি হওয়াতে তাদের মজুরিও কম হয়ে থাকে।

৫। **ব্যবসায় আয়তন (Size of business) :** একটি ব্যবসায়ের আয়তনের ওপর ভিত্তি করেও মজুরি নির্ধারণ করা হয়। ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠান যত বড় তাদের কর্মীদের বেতন তত বেশি হয়। ব্যবসায়ের আকার ছোট হলে বেতন কম হয়। তবে মুনাফা সর্বোচ্চ হলে বেতনের পরিমাণও বাড়তে পারে।

৬। **কর্মীদের জোগান ও চাহিদা (Supply and demand of labour) :** মজুরি হার নির্ধারণ নির্ভর করে শ্রমের যোগান ও চাহিদার উপর। শ্রমের জোগান বেশি হলে তাদেরকে তুলনামূলকভাবে কম মজুরিতে নিয়োগ দেওয়া যায়। অপরদিকে শ্রমের জোগান কম হলে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মজুরি বেশি হয়ে থাকে।

৭। **কর্মীদের নিরাপত্তা (Security of labour) :** কর্মী যদি চাকরি ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পায় তবে তারা অল্প বেতনে কাজ করতেও রাজি হয়। এতে প্রতিষ্ঠানের সুবিধা হলো তারা কম খরচে দক্ষ কর্মী দ্বারা অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারে।

৮। **ভৌগোলিক অবস্থান (Geographic location) :** শ্রমিক কর্মীর মজুরি ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ–গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বেতন ও মজুরি কম হলেও পাহাড়ি অঞ্চলের বেতন ও মজুরি বেশি হয়ে থাকে।

৯। **কার্যের মেয়াদ এবং কার্য বাস্তবায়ন (Employee tenure and performance) :** শ্রমিক-কর্মী কার্য কতটুকু সম্পাদন করতে পারে তা লক্ষ করে ক্ষতিপূরণ নির্ণয় করা হয়। কোনো কর্মীর কার্য মেয়াদ যদি বৃদ্ধি করা হয় তবে বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও বেড়ে যায়। এতে তারা নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পায়।

১০। **পুরুষ কর্মী বনাম মহিলা কর্মী (Gender difference) :** প্রতিষ্ঠানে পুরুষ এবং মহিলা উভয় কর্মীই কাজ করে থাকে। আমাদের দেশে সাধারণত মহিলার চাইতে পুরুষ কর্মীদের মজুরি বেশি হয়ে থাকে।

১১। কোম্পানির মুনাফাযোগ্যতা (Profitability of the firm) : মজুরি হার নির্ধারণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কোম্পানি কী পরিমাণ মুনাফা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। কারণ প্রতি কোম্পানির মুনাফা যত বৃদ্ধি পাবে ততই কর্মীদের মজুরি বাড়বে। মুনাফা কম হলে ক্রমেই মজুরি বা বেতনও হ্রাস পাবে।

১২। ব্যবস্থাপনা দর্শন (Philosophy of management) : কিছু নির্বাহী বিশ্বাস করে যে, শ্রমিক কর্মীদেরকে যত বেশি সম্ভব ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। অন্যদিকে কিছু নির্বাহীদের মধ্যে বিপরীত দর্শনও কাজ করে। তবে এটি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, আর্থিক সক্ষমতা ও উৎপাদনশীলতার গতি প্রকৃতির উপর।

পরিশেষে বলা যায় যে, উল্লেখিত সকল পদ্ধতি বেতন ও মজুরি হার নির্ধারণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক। সুতরাং এগুলো বিবেচনায় রেখেই কোম্পানির ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণ করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

বেতন ও মজুরি দুটি হলো আর্থিক সুবিধা। অর্থাৎ উভয়ই অর্থের সাথে সম্পৃক্ত এবং কর্মীদের আর্থিক সুবিধা দেয়। কিন্তু তারপরও এদের মধ্যে কিছু ভিন্নতা আছে। যেমন– নিম্ন স্তরে যারা কাজ করে তাদের মজুরি দেওয়া হয় যা ঘণ্টাভিত্তিক, বা সাপ্তাহিক হয়। আর মধ্য ও উচ্চ স্তরের কর্মীদের বেতন দেওয়া হয় যা মাস ভিত্তিক হয়ে থাকে। তাছাড়া এর পাশাপাশি বেতন ও মজুরির হার নির্ধারণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এতে কর্মী ও প্রতিষ্ঠান উভয়ই সন্তুষ্ট হয়।

পাঠ-২.২ ক্রান্তিকালীন বিশ্ব ও ক্ষতিপূরণের অর্থনৈতিক তত্ত্ব

(A World in Transition and Economic Theory of Compensation)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ক্রান্তিকালীন বিশ্ব ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ক্ষতিপূরণের অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্রান্তিকালীন বিশ্ব

A World in Transition

ক্রান্তিকালীন বিশ্ব বলতে বোঝানো হচ্ছে পরিবর্তিত বিশ্বের সাথে খাপ খাইয়ে চলা। Alvin Taffler তার 'Future Shock' গ্রন্থে বলেছেন যে, বিশ্বে দ্রুত পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা দেখা যায়। তিনি আরও বলেন যে, আমলাতন্ত্র একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠন কাঠামো যা একটি দেশ বা কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেটি পরিবর্তনের মতো সংকটকে মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। যদি তা পারত তাহলে তাদের সকল উদ্ভাবনকে কাজে লাগিয়ে উন্নত ভবিষ্যৎ গড়তে পারত।

ক্রান্তিকালীন বিশ্বের পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা কোম্পানির কার্যক্রমকে প্রভাবিত করে। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ের শ্রমিকদের অধিকসংখ্যক চলককে মোকাবিলা করতে হয়। অধিকন্তু অধিকতর জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত সময়ও হাতে থাকে না। সমস্যার জগতে টিকে থাকাটা খুবই জটিল হয়ে দাঁড়ায়। সঠিক কাজের জন্য ক্রমাগতভাবে চাপ দেওয়া হয়। ভুল করা হলে কোম্পানি ও শ্রমিকদের জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। শ্রমিকদেরকে এ রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যে কাজ করতে হয় বিধায় সংগঠনগুলো প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে।

প্রতিষ্ঠানগুলো প্রতিনিয়তই নকশাকরণ, কাঠামো ও কর্মসংস্থান করছে এবং এতে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কাজের সুযোগ এবং ক্ষতিপূরণের হারও পরিবর্তন হয়েছে। ফলে সকল শর্ত পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করছে এবং ক্রমাগত প্ররোচিত করছে, তা কর্মের সুযোগ সৃষ্টিতে এবং শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের হার নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখছে। পরিবর্তনের সময় কর্মীদের বেতন ও মজুরি বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতা, ধীর অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি, স্বল্প অগ্রগতির সুযোগ ও কর্মীদের সচেতনতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর খেয়াল রাখতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় যে, উপর্যুক্ত বিষয়ের উপর লক্ষ রেখে কোম্পানিতে পরিবর্তন আনা উচিত। তা না হলে পরিবর্তিত এ বিশ্বে টিকে থাকা সম্ভব নয়।

ক্ষতিপূরণের অর্থনৈতিক তত্ত্ব

Economic Theories of Compensation

প্রতিষ্ঠানে বা ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিপূরণের অর্থনৈতিক তত্ত্ব প্রচলিত আছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো :

(১) সামষ্টিক তত্ত্বসমূহ

সমাজ কাজের জন্য কী পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে ইচ্ছুক বা ন্যায্যতা সম্পর্কের অনেক তত্ত্ব বেতন ও মজুরিকে কীভাবে প্রভাবিত করে সেগুলো সামষ্টিক তত্ত্বে আলোচনা করা হয়েছে। এ তত্ত্বে সামাজিক মজুরি তত্ত্ব, মজুরি নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব ও যাচাইমূলক তত্ত্ব অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ক. **সামাজিক মজুরি তত্ত্ব :** সামাজিক মজুরি তত্ত্বে বিদ্যমান তত্ত্বসমূহ হলো–(i) জীবনযাপন উপযোগী মজুরি তত্ত্ব ; (ii) শুধু মূল্য তত্ত্ব ; (iii) শুধু মুজুরি তত্ত্ব ; (iv) মজুরি তহবিল তত্ত্ব ; (v) অবশিষ্ট দাবিদার তত্ত্ব ও (vi) উদ্বৃত্ত মূল্য। নিম্নে সামাজিক মজুরি তত্ত্ব আলোচনা করা হলো–

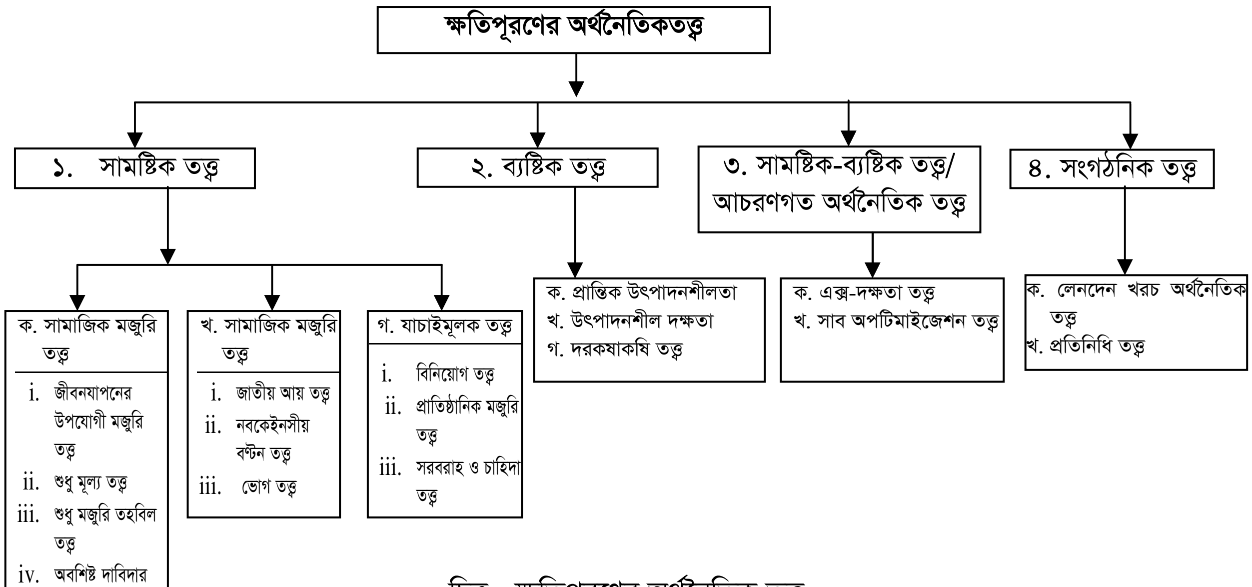

চিত্র : ক্ষতিপূরণের অর্থনৈতিক তত্ত্ব

(i) জীবনযাপনের উপযোগী মজুরি তত্ত্ব (Subsistence theory of wage) : এ তত্ত্বটিতে বলা হয়েছে যে, বেঁচে থাকার জন্য সমাজের প্রতিটি সদস্যকে পর্যাপ্ত খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান দিতে হবে। যখন আয় জীবনধারণের পর্যায় থেকে বেশি হয় তখন কর্মীকে কাজে আরো উৎসাহিত করা হয়। এ তত্ত্বটিতে আরও বলা হয়েছে উৎপাদন বেশি হলে পণ্যের চাহিদা কমে যায়, ফলে তাদের ক্ষতিপূরণের হার কমে যায়। এটি মজুরির লৌহ আইন হিসেবে পরিচিত। এ তত্ত্বটি অনেক প্রাচীন তত্ত্ব যা ডেভিড রিকার্ডো উন্নয়নসাধন করেন।

(ii) শুধু মূল্য তত্ত্ব (Just Price Theory) : এ তত্ত্বটি প্লেটো ও অ্যারিস্টটল খ্রিষ্টীয় ৩০০ বছর পূর্বে প্রবর্তন করেন। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে প্রতিটি মানুষ জন্মগ্রহণ করে বেঁচে থাকার জন্য। তার বাবা ও মা যেভাবে সবকিছু ভোগ করেছেন, তেমনি তারাও সমভাবে তা ভোগ করতে পারবে। তারা আরও বলেন, শ্রমিকগণ যেন পর্যাপ্ত মজুরি পায় এবং এটি তাদের অধিকার।

(iii) শুধু মজুরি তত্ত্ব (Just wage theory) : এ তত্ত্বটির জনক হলেন সেন্ট থমাস অ্যাকুইনাস। এ তত্ত্বটি ইউরোপে মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের প্রচলনের সময় জনপ্রিয়তা পায়। সে সময় চার্চ ও সরকারি দালানকোঠা বেশি করে তৈরি করা হয় এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম খুব বেশি বৃদ্ধি পায়। ফলে অধিক সংখ্যক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়, বিশেষ করে দক্ষ লোকদের যেমন- শিল্পী, হাতের নকশার কাজ করে এমন দক্ষ লোকদের মূল্য বেড়ে যায়। এ তত্ত্বে ব্যবসায়ীর লাভের দিকটি উপেক্ষিত হয়েছে এবং দুজন কর্মীর দক্ষতার পার্থক্যের বিষয়টির বিবেচনা করা হয়নি।

(iv) মজুরি তহবিল তত্ত্ব (The Wage fund theory) : এ তত্ত্বটির প্রবক্তা হলেন John Stuart Mill এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে একটি তহবিল থেকে কর্মীদের পারিতোষিক পরিশোধ করা হয় যা উদ্যোক্তা পূর্ববর্তী বছরের কার্যাবলি থেকে অর্জন করেছেন। এই তহবিলটি উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এ তত্ত্বের দুর্বল দিক হলো ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করতে হয় বর্তমান ব্যাবসায়িক কার্যক্রমের জন্য কিন্তু তত্ত্বে বলা হয়েছে পূর্ববর্তী বছরের কথা।

(v) অবশিষ্ট দাবিদার তত্ত্ব (Residual claimant theory) : এ তত্ত্বটি ফ্রান্সিস এ. ওয়াকার কর্তৃক প্রবর্তন করা হয় যা "রাজনীতিক অর্থনীতির তত্ত্ব"-এর বর্ধিত রূপ। এ তত্ত্বটি মজুরি তহবিল তত্ত্বেরই অনুরূপ। এখানে ধারণা করা হয়েছে যে, পারিতোষিক তহবিল পূর্ববর্তী বছরের ব্যাবসায়িক কার্যক্রম থেকে আসে না, কিন্তু এটি মোট লাভ থেকে আসে। এ তত্ত্বে বলা হয়েছে কিছু খরচ যেমন- খাজনা, ভাড়া, কর, সুদ ইত্যাদি বাদ দিয়ে যা অবশিষ্ট থকে, তা থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা উচিত।

(vi) উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus value) : বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ কার্ল মার্কস এ তত্ত্বটির প্রবক্তা। এটি "অবশিষ্ট দাবিদার" তত্ত্বেরই অনুরূপ। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে কর্মী হচ্ছে অর্থনৈতিক মূল্যের উৎস এবং এ কারণে কর্মীগণকে আয়ের উপর মূল দাবিদার বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেন, শ্রমের মূল্য ও পণ্যের মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য হয়, তা পরিশোধ করা উচিত। তিনি বলেন, কর্মীগণ জীবনধারণের জন্য যেটুকু দরকার সেটুকু গ্রহণ করে, যদিও লাভ তাদের দ্বারাই হয়। বাকিটুকু মালিক নিয়ে নেয়।

খ. মজুরি নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বসমূহ (The Wage Control Theories) : মজুরি নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বে বিদ্যমান তত্ত্বসমূহ হলো– (i) জাতীয় আয় তত্ত্ব ; (ii) নব-কেইনসীয় বণ্টন তত্ত্ব ও (iii) ভোগ তত্ত্ব। এ তত্ত্বগুলোতে মজুরির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে বিভিন্ন ধরনের মজুরি নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বসমূহ আলোচনা করা হলো–

(i) জাতীয় আয় তত্ত্ব (National Income Theory) : এ তত্ত্বটিকে পূর্ণ কর্মসংস্থান মজুরি তত্ত্বও বলা হয়। 'জাতীয় আয়ের লক্ষ্য হলো পূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা'- এটিই এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। জাতীয় আয় হলো মোট ভোগ ও সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগের সমষ্টি। যদি জাতীয় আয় পূর্ণ কর্মসংস্থান স্তরের নিচে নেমে যায়, তাহলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির জন্য সরকারকে যেকোনো পদক্ষেপ নিতে হয়। এ তত্ত্বে বলা হয়েছে, সরকার হলো অর্থসংক্রান্ত আর্থিক নীতি নিয়ন্ত্রণের পক্ষ। সাথে সাথে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে যাতে পূর্ণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায়।

(ii) নব-কেইনসীয় বণ্টন তত্ত্ব (The Neo-Keynesian Distribution Theory) : এ তত্ত্বটি জাতীয় আয় তত্ত্বের বর্ধিত রূপ। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে স্থায়ী মূল্যমান বজায় রেখে অথবা সাধারণ জীবনযাত্রার মানের সাথে সংঘর্ষে না জড়িয়ে কীভাবে পূর্ণ কর্মসংস্থান বজায় রাখা যায়। এ তত্ত্বটি হলো স্বল্প বা দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিপূরণের সাধারণ স্তর। এটি স্বীকার করে যে স্বল্পমেয়াদে উদ্যোক্তাসুলভ সিদ্ধান্ত ক্ষতিপূরণের স্তর নির্ধারণ করতে পারে। এখানে মজুরির হার মালিক ও শ্রমিকদের মধ্যে দর-কষাকষির মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে।

(iii) ভোগ তত্ত্ব (Consumption Theory) : উনিশ শতকের পরে মজুরি তত্ত্বসমূহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে যুক্ত হয়ে যায়। আমিরেকার বিখ্যাত শিল্পপতি হেনরি ফোর্ড ভোগ তত্ত্ব প্রবর্তন করেন। এ তত্ত্বটিকে ক্রয়ক্ষমতা তত্ত্বও বলা হয়। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে কর্মীদেরকে উচ্চ হারে মজুরি পরিশোধ করলে তারা অধিক পণ্য কিনতে পারে যা তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে। ফলে উদ্যোক্তাদের মুনাফার হার বৃদ্ধি পাবে। ফোর্ডের এ তত্ত্বকে মার্কস-এর তত্ত্বের সাথে তুলনা করা হয়। যদিও মার্কস বাস করতেন রাজতন্ত্রের সমাজে, আর ফোর্ড বাস করতেন গণতান্ত্রিক সমাজে। কিন্তু কেউ কেউ হেনরি ফোর্ড-এর তত্ত্বকে "নতুন মজুরি তত্ত্ব" হিসেবে বর্ণনা করেছেন। উচ্চ মজুরি ভোগকে উৎসাহিত করে, পণ্যের চাহিদা বাড়ায় এবং পণ্যের দাম কমায় যার ফলে এ তত্ত্বটি মজুরি নিয়ন্ত্রণ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত।

গ. যাচাইমূলক তত্ত্বসমূহ (Justification Theories) : যাচাইমূলক তত্ত্বে বিদ্যমান তত্ত্বসমূহ হলো– (i) বিনিয়োগ তত্ত্ব ; (ii) প্রাতিষ্ঠানিক মজুরি ও (iii) সরবরাহ ও চাহিদা তত্ত্ব। যাচাইকৃত তত্ত্বগুলো খুবই যৌক্তিক। এ তত্ত্বসমূহ

কর্মীদের ব্যক্তিক মজুরি স্তর বিশ্লেষণের প্রয়াস পায়। এ তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত প্রথম তিনটি তত্ত্ব সার্বিক সামষ্টিক দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষতিপূরণের স্তর নির্ধারণের কাজ করে। নিচে এগুলো বর্ণনা করা হলো:

(i) বিনিয়োগ তত্ত্ব (The Investment Theory) : H. M. Getelman এ তত্ত্বের প্রবর্তক। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে শ্রম বাজার কোনো নির্দিষ্ট শিল্পে কর্মীদের বিনিয়োগের সুযোগ এক কোম্পানি থেকে অন্য কোম্পানির পৃথক হয়। শ্রম বাজার বড় হলে ক্ষতিপূরণের হার উচ্চ হয়। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতার উপর ব্যক্তিক কর্মীর বিনিয়োগ নির্ভর করে যা কর্মীগণ সারা জীবনের জন্য বিনিয়োগ করেছে।

(ii) প্রাতিষ্ঠানিক মজুরি তত্ত্ব (The Institutional Theory) : এ তত্ত্বটি সংখ্যাত্মকভাবে ক্ষতিপূরণের স্তর নির্ধারণের চেষ্টা করে। এটি ক্ষতিপূরণের সব কয়টি দিকের সমন্বয় করে যাতে কিছু বিবেচ্য বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। যেমন–বেতন ও মজুরির অভিজ্ঞতা, বেতন ও মজুরির বৈচিত্র্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পর্ক ও দর-কষাকষির প্রভাব ইত্যাদি। ক্ষতিপূরণের স্তর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের পছন্দের ওপর নির্ভর করে থাকে।

(iii) সরবরাহ ও চাহিদা তত্ত্ব (Supply and Demand Theory) : এ তত্ত্বটি হচ্ছে সবচেয়ে কম ভুল সম্পন্ন একটি তত্ত্ব। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে যদি চাকরির সুযোগ বা সংখ্যা কম হয়, কর্মী সংখ্যা বেশি হয়, তা হলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কম হবে। অন্যদিকে কাজের সুযোগ বেশি হলে এবং শ্রম সংখ্যা কম হয়, তাহলে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বেশি হবে। দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিপূরণের হার একটি নির্দিষ্ট সীমায় এসে স্থির হয় যেখানে চাহিদা ও সরবরাহ রেখা একটি নির্দিষ্ট পয়েন্টে এসে মিলিত হয়। বিশেষ করে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এ ঘটনাটি বেশি ঘটে।

(২) ব্যষ্টিক তত্ত্বসমূহ (Micro Theories)

কোনো নির্দিষ্ট শিল্প কারখানা বা কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কাঠামো নির্দেশক বিভিন্ন তত্ত্ব ব্যষ্টিক তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এই তত্ত্বে বিদ্যমান তত্ত্বসমূহ হলো– (i) প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা; (ii) উৎপাদনশীল দক্ষতা; (iii) দর-কাষাকষি তত্ত্ব।

নিচে ব্যষ্টিক তত্ত্বসমূহ আলোকপাত করা হলো:

ক. **প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা (Marginal Productivity)** : এ তত্ত্বটি ১৮৭৬ সালে জার্মানির অর্থনীতিবিদ জোহান হেনরিক ভন থারেন প্রবর্তন করেন। পরবর্তীতে এটি ইংল্যান্ডের ফিলিপ হেনরি উইকস্টিড এবং আমেরিকার জন বেটস ক্লার্ক উন্নয়ন করেন। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে একজন কর্মীর মজুরি উৎপাদনশীলতার অতিরিক্ত মূল্যের সমান হওয়া উচিত যা মোট উৎপাদনে মিলিত হয়। একজন কর্মীর উৎপাদনের মূল্য নির্ধারিত হয় মালিক ওই উৎপাদন থেকে কতটুকু মুনাফা পেল তার উপর। মালিক যদি অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ দেয়, তাহলে সর্বশেষ নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মীকে পর্যাপ্ত পরিমাণ উৎপাদন করতে হবে যাতে তার ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করা যায়। অতিরিক্ত একজন নিয়োগ করা হলে সে যে মুনাফা আয় করবে তা তার ক্ষতিপূরণের সমান হবে না। সব শেষে যে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয় তাকে বলা হয় প্রান্তিক কর্মী এবং সে যা উৎপাদন করে তা হলো প্রান্তিক উৎপাদন।

খ. **উৎপাদনশীল দক্ষতা (The Productive Efficiency)** : এ তত্ত্বটি প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা তত্ত্ব থেকে উদ্ভব হয়েছে। এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো প্রতিটি কর্মীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল দক্ষতা বৃদ্ধি করে ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়া। এ তত্ত্বটির ভিত্তি হলো আর্থিক প্রেষণা। যেমন– প্রণোদনা সিস্টেম, বোনাস ও মুনাফার অংশ ইত্যাদি। অনেক অর্থনীতিবিদ এ তত্ত্বকে গঠনমূলক মনে করেন।

গ. **দর-কষাকষি তত্ত্ব** (**Bargaining Theory**) : অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ এর প্রবন্ধ থেকে দর-কষাকষি তত্ত্ব সম্পর্কে জানা যায়। ১৮৯০ সালের শেষ দিকে জন ডেভিডসন এ তত্ত্বটি বিশদভাবে আলোচনা করেন। এ তত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো– কর্মীর ক্ষতিপূরণের হার কী হবে তা মালিক ও কর্মীদের মধ্যে দর-কষাকষির উপর নির্ভর করে। এ তত্ত্বে আরো বলা হয়েছে, যেকোনো শ্রমিকের কর্ম অর্থনীতিক মূল্যের বিনিময়ে সম্পন্ন হয়ে থাকে। এ তত্ত্বটির ভিত্তি হলো, কোনো নির্দিষ্ট কর্মের জন্য কোনো স্থির ক্ষতিপূরণ হার নেই বরং কিছু ক্ষতিপূরণ হারের মাত্রা দিয়ে থাকে। এর উচ্চমাত্রা সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ হার নির্ধারিত হয় যা মালিক প্রদান করতে সক্ষম এবং নিম্নমাত্রা নিম্ন ক্ষতিপূরণ হার নির্ধারিত হয়।

(৩) সামষ্টিক-ব্যষ্টিক/আচরণগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Behavioral Economic Theory)

এ তত্ত্বের মূল বিষয় হলো– প্রতিষ্ঠান হলো ব্ল্যাক বক্স যা কাঁচামাল থেকে পণ্য উৎপাদন করে। কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কোম্পানির উৎপাদনে প্রভাব বিস্তার করে। এজন্য অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও পারিশ্রমিক নিয়ে বেশি বেশি করে চর্চা করা প্রয়োজন।

ক. **এক্স-দক্ষতা তত্ত্ব** (**X-Efficiency Theory**)ঃ এইচ. লিবেনস্টিন এ তত্ত্বের প্রবর্তন করেন। তার এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক উৎপাদনশীলতায় অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনার প্রভাব রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, যে সকল কোম্পানি প্রতিযোগিতামূলক অবস্থায় কাজ করছে, তারা প্রযুক্তির পরিবর্তন না করেই শুধু অভ্যন্তরীণ কার্য প্রক্রিয়ার পরিবর্তনে উৎপাদন বেশি করতে পারে। তিনি বলেছেন যে, কোম্পানির প্রকৃত উৎপাদন প্রতিযোগিতামূলক কাম্য স্তর পর্যন্ত খুব কমই পৌঁছাতে পারে। কোম্পানির অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে যে উৎপাদন করা সম্ভব, কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা চিহ্নিত করেও অনেক সময় তা সম্ভব নয়। এখানেই এক্স-দক্ষতা ও এক্স-অদক্ষতার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। তিনি আরও বলেন যে, অভ্যন্তরীণ পুরস্কার ব্যবস্থাপনা ও নব্য ধ্রুপদি মতবাদের আচরণকে কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় রাখা প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ পুরস্কার ও প্রণোদনা কাঠামো, কার্য প্রচেষ্টা, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা সিস্টেম দ্বারা উৎপাদনশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয়।

খ. **সাব অপটিমাইজেশন তত্ত্ব** (**Sub Optimization Theory**) : এ তত্ত্বটি হারবার্ট সাইমন ও লিবেনস্টেইন কর্তৃক উন্নয়নকৃত। এ তত্ত্বের মূল বিষয় হচ্ছে ব্যবস্থাপকদের কাজ যৌক্তিক ভাবে সম্পাদন করতে হয়। যৌক্তিকতার প্রশ্ন আসে যে কারণে তা হলো ব্যবস্থাপকদের সব কর্ম সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান থাকে না এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে কাম্য কার্যটি গ্রহণে বুঝে উঠতে পারে না আবার কাম্য কর্মটির জন্য অনেক সময় প্রয়োজনীয় সম্পদ ও পাওয়া যায় না। এজন্য তারা কাম্য সিদ্ধান্তের কাছাকাছি পর্যায়ে কাজ করে। তাই এ তত্ত্বটির নামকরণ করা হয়েছে সাব অপরিমাইজেশন তত্ত্ব। সাইমন ও লিবেনস্টেইন দেখতে পান যে, ব্যক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অর্থনৈতিক আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়।

(৪) সাংগঠনিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব (Organizational economic theories)

অর্থনৈতিক আচরণের সাথে সম্পর্কিত কতকগুলো তত্ত্ব ও মডেল যা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতির উপর কেন্দ্রীভূত, সেগুলোকে সাংগঠনিক অর্থনীতির তত্ত্ব বলা হয়। এগুলো নিম্নরূপঃ

ক. লেনদেন খরচ অর্থনৈতিক তত্ত্ব (**Transaction cost economic theory**) : এ তত্ত্বটি অলিভার উইরিয়ামসন (Oliver Williamson) উন্নয়ন সাধন করেন। বিভিন্ন পদের মধ্যে পণ্য ও সেবা বিনিময়ের কাজ বিভিন্ন সময় খরচগুলো বেড়ে যায়। তখন বাজারে প্রণোদনামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, বিনিময়

খরচগুলোকে অদৃশ্য করার জন্য। এ থেকে এটি স্পষ্টত বোঝা যায় যে, প্রতিষ্ঠানে একটি সঠিকভাবে নকশাকৃত বেতন ও মজুরি কাঠামো থাকা প্রয়োজন এবং এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

খ. প্রতিনিধি তত্ত্ব **(Agency theory)** : প্রতিনিধি তত্ত্বটি অন্যান্য তত্ত্বের তুলনায় প্রতিষ্ঠানের জন্য বেতন ও মজুরি বা পারিতোষিক সিস্টেম নকশাকরণে সবচেয়ে বেশি যৌক্তিক ভূমিকা রাখে। সঠিক তথ্যের অভাবে ব্যবস্থাপনা ও শেয়ার হোল্ডারদের মধ্যে বিভিন্ন স্বার্থচিন্তা আসতে পারে। এ তত্ত্বের মূল কথা হলো প্রতিনিধিগণ শ্রমিক কর্মীদের পক্ষে কাজ করবে মালিক বা ব্যবস্থাপনার সাথে বসে যাতে একটি গ্রহণযোগ্য পারিতোষিক সিস্টেম প্রবর্তন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত যত তত্ত্ব উদ্ভাবন হয়েছে সেগুলো বেতন ও মজুরির উপর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। অর্থাৎ ব্যক্তিক, প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক বা বৈশ্বিক পর্যায়ে ক্ষতিপূরণের উপর কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা বিভিন্ন তত্ত্বের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের যুগ। প্রযুক্তিনির্ভর এ যুগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন দ্রুত সাধিত হচ্ছে। এজন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানে খাপ খাইয়ে চলা অনেক সময় সম্ভবপর হয় না। বর্তমান বিশ্বে কর্মীর মজুরি ও বেতন নির্ধারণের জন্য অনেক তত্ত্বসমূহ বিদ্যমান। এসকল তত্ত্ব হতে প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করে থাকে।

পাঠ-২.৩ প্রণোদনামূলক মজুরি
Incentive Wages

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- প্রণোদনামূলক মজুরির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রণোদনামূলক মজুরির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রণোদনামূলক মজুরি নির্ধারণে বিবেচ্য বিষয় বর্ণনা করতে পারবেন।
- প্রণোদনামূলক মজুরির নীতিমালা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রণোদনামূলক মজুরির সংজ্ঞা
Definition of Incentive Wages

সাধারণত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের তাদের কাজের বিনিময়ে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয় তাকে বেতন বা মজুরি বলে। কিন্তু তাদেরকে কাজের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য, আরও দক্ষ ও অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য যে অতিরিক্ত আর্থিক ও অনার্থিক সুবিধা প্রদান করা হয় তা হলো প্রণোদনামূলক মজুরি। প্রণোদনামূলক মজুরি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞদের সংজ্ঞা নিম্নরূপ:

National Commission on Labor বলেন, "Wage incentives are extra financial motivation." অর্থাৎ প্রণোদনামূলক মজুরি বলতে অতিরিক্ত আর্থিক প্রেষণা প্রদানকে বোঝানো হয়েছে।

Dr. C. B. Mamoria এর ভাষায়, "Wage Incentives as a system of payment under which the amount payable to a person is linked with his output." অর্থাৎ কর্মীদের কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে যে অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয় তাই হলো প্রণোদনামূলক মজুরি।

প্রণোদনামূলক মজুরির সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে যে বিষয়সমূহ পাওয়া যায় তা হলো–প্রণোদনামূলক মজুরি মূল মজুরি কাঠামোর অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করা হয়, এর ফলে শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায় এবং কার্য সম্পাদনে শ্রমিকদের কঠোর পরিশ্রম এবং উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করে থাকে।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রণোদনামূলক মজুরি হলো এমন একটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কর্মীর কাজে আগ্রহ বাড়ে ও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হয়। এছাড়া এটি এমন একটি পরিকল্পনা যার মাধ্যমে অতিরিক্ত কর্মদক্ষতার জন্য শ্রমিকদের নিয়মিত মজুরির অতিরিক্ত হিসেবে প্রদান করা হয়।

প্রণোদনা মজুরির উদ্দেশ্য
Objectives of Incentives Wages

প্রণোদনামূলক মজুরির প্রধান উদ্দেশ্য হলো কর্মীদের কাজের প্রতি দক্ষ করে তোলা। তাদের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন করাই হলো এই মজুরির বিশেষ কাজ। নিম্নে উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনা করা হলো :

(১) **কাজে আগ্রহ বৃদ্ধি :** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের প্রতি আগ্রহী করে তোলাই হলো প্রণোদনামূলক মজুরির প্রধান উদ্দেশ্য। এর ফলে কর্মীরা তাদের কাজকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন ত্বরান্বিত হয়।

(২) **উৎপাদন বৃদ্ধি :** প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে প্রণোদনামূলক মজুরির ব্যবস্থা করা হয়। কর্মীদেরকে তাদের কাজের ভিত্তিতে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করলে তারা সন্তুষ্ট হয়ে মনোযোগ দিয়ে কাজ করে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

(৩) **মুনাফা বৃদ্ধি :** প্রতিষ্ঠানে মুনাফা যত বাড়বে সুনামও তত বাড়বে। মুনাফা অর্জন করা হলো প্রণোদনামূলক মজুরির মূখ্য উদ্দেশ্য।

(৪) **কর্মীর দক্ষতা বৃদ্ধি :** প্রতিষ্ঠানে কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা প্রণোদনামূলক মজুরির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য। তাদের অতিরিক্ত মজুরি প্রদান করলে তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয় এবং নিজের মেধা দিয়ে সর্বোচ্চটুকু অর্জনের চেষ্টা করে। ফলে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

(৫) **সুসম্পর্ক স্থাপন :** প্রণোদনামূলক মজুরি প্রদানের ফলে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যকার সম্পর্ক ভালো হয়। তারা একে অপরকে যেকোনো কাজে সহযোগিতা করতে পারে এবং তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বা কাজে কোন বাধা সৃষ্টি হয় না।

(৬) **প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন :** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীরা যাতে গুরুত্বসহকারে কাজ করে এবং দ্রুত লক্ষ্য অর্জন করে তার জন্য এই প্রণোদনামূলক মজুরির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে তারা দ্রততম সময়ে কার্য সম্পাদন করে লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয়।

(৭) **দ্রুত কাজ সম্পাদন :** প্রণোদনামূলক মজুরির বিশেষ একটি উদ্দেশ্য হলো কম সময়ে কর্মীদের দিয়ে অধিক এবং দ্রুত কার্য সম্পাদন করিয়ে নেওয়া। কারণ মজুরি পাওয়ার আশায় শ্রমিক কর্মীরা দ্রুত কাজ সম্পাদন করে থাকে।

(৮) **সময়ের অপচয় হ্রাস :** প্রণোদনামূলক মজুরির ফলে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীরা কম সময়ে অধিক কাজ সম্পন্ন করে। ফলে এতে অর্থ ও সময়ের অপচয় হ্রাস পায়।

(৯) **ব্যয় হ্রাস :** সাধারণত মালিকরা কর্মীদের আগে থেকে বলে দেয় যে তারা যত ব্যয় কমাতে পারে, মুনাফা তত বাড়বে। কারণ এতে কর্মীদেরই লাভ, অর্থাৎ তাদের কাজে খরচ যত হ্রাস পাবে তাদের মজুরির পরিমাণ ততই বাড়বে। তাই শ্রমিক-কর্মীরা কার্য সম্পন্ন করার সময় খেয়াল রাখে যত সম্ভব যাতে ব্যয় হ্রাস পায়।

(১০) **সন্তুষ্টি অর্জন :** প্রণোদনামূলক মজুরির অন্যতম একটি উদ্দেশ্য হলো কর্মীদের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি বৃদ্ধি করা। এই অতিরিক্ত সুবিধা প্রাপ্তির ফলে কর্মীদের মনে কোনো হতাশা, ক্ষোভ থাকে না এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

পরিশেষে বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এবং কর্মীদের আরও দক্ষ করে গড়ে তোলার জন্য প্রণোদনামূলক মজুরি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রণোদনা মজুরির বিবেচ্য বিষয়সমূহ
Considering factors of Incentives Wages

সাধারণত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক কর্মীদের কাজের বিনিময়ে যে মজুরি প্রদান করা হয় তার থেকেও অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া হলে তাকে বলে প্রণোদনামূলক মজুরি। এর ফলে কর্মীরা সন্তুষ্ট ও উৎসাহিত হয়। এই মজুরি প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে সকল প্রতিষ্ঠানের যেকোনো ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হয়। তেমনি প্রণোদনামূলক মজুরির ক্ষেত্রেও কিছু বিবেচনা বিষয় করতে হয়, যা নিম্নরূপ:

(১) **মুনাফা অর্জন :** প্রণোদনামূলক মজুরি প্রদানের সময় বিবেচনা করতে হবে যে এতে প্রতিষ্ঠানে সঠিক হারে মুনাফা অর্জিত হচ্ছে কি না। কারণ মুনাফা যতই বৃদ্ধি পাক এতে কর্মীদের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানেরও যাতে লাভ হয়, তা বিবেচনায় আনতে হবে।

(২) **কাজের প্রতি সন্তুষ্টি বৃদ্ধি :** সাধারণত কর্মীদের কাজের প্রতি সন্তুষ্টি বৃদ্ধির জন্য এই মজুরির ব্যবস্থা করা হয়। তাই মজুরি প্রদানের পূর্বে যাচাই করতে হবে যে তারা এই মজুরি পেয়ে সন্তুষ্ট আছে কি না। কারণ এই মজুরিতে কর্মী সন্তুষ্ট হলে তাদের কাজের প্রতিও আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

(৩) **উৎপাদনশীলতা বাড়ানো :** প্রণোদনামূলক মজুরির ব্যবস্থা করার অন্যতম কারণ হলো এর ফলে যাতে প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। তাই মজুরি প্রদানের পূর্বে লক্ষ রাখতে হবে যে এর ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে কি না। যদি

না বাড়ে তবে এতে কর্মীদের লাভ হলেও মালিকের ক্ষতি হবে। তাই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির বিষয়টিকে বিশেষভাবে বিবেচনা করতে হবে।

(৪) **ব্যবস্থাপক ও কর্মীর মধ্যকার সম্পর্ক :** প্রণোদনামূলক মজুরি প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয় হলো ব্যবস্থাপক ও কর্মীর মধ্যকার সম্পর্ক কী অবস্থায় আছে তা নির্ধারণ করা। যদি সম্পর্ক উন্নত হয় তবে প্রতিষ্ঠান দ্রুততার সাথে লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে, তা না হলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

(৫) **সহজ ও সার্বিক পদ্ধতি :** 'প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থা সহজ হতে হবে যাতে শ্রমিক-কর্মী তা বুঝতে পারে। পদ্ধতি সহজ ও সার্বিক হলে ব্যবস্থাপক ও কর্মী উভয়ই সন্তুষ্ট হবে এবং তাদের যেকোনো কাজের মধ্যে কোনো বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হবে না।

(৬) **আইনসম্মত ব্যবস্থা :** প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থা চালু করার পূর্বে অবশ্যই এটি আইনসম্মত ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। কারণ আইনের অনুমতি না থাকলে সেক্ষেত্রে এটি গ্রহণযোগ্য হবে না।

(৭) **স্বল্প সময়ে অধিক কাজ :** প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের দ্বারা স্বল্প সময়ে অধিক কাজ করিয়ে নেওয়া হলো প্রণোদনামূলক মজুরির মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই মজুরি প্রদানের পূর্বে লক্ষ্য রাখতে হবে কর্মচারী কত সময়ের মধ্যে কতটুকু কাজ করতে সক্ষম।

(৮) **কর্মীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা :** প্রণোদনামূলক মজুরি প্রদানের আগে যাচাই করতে হবে কোনো কর্মী কতটুকু দক্ষ, অভিজ্ঞ। তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে মজুরি প্রদান করতে হবে।

(৯) **উৎপাদন ব্যয় হ্রাস :** প্রণোদনামূলক মজুরির বিবেচ্য বিষয়ের মধ্যে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে উৎপাদন যতই বৃদ্ধি হোক কিন্তু পাশাপাশি উৎপাদন ব্যয় যাতে বৃদ্ধি না পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সুতরাং বলা যায় যে, উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো প্রণোদনামূলক মজুরির সময় অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। আর এই প্রণোদনামূলক মজুরির কল্যাণে কর্মীর কাজের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। ফলশ্রুতিতে মুনাফা বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিষ্ঠান তার লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে।

প্রণোদনামূলক মজুরির নীতিমালা
Principles of Incentives Wages

প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের কাজের বিনিময়ে যে মজুরি দেওয়া হয় তার থেকেও অধিক হারে যে আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয় তা হলো প্রণোদনামূলক মজুরি। তবে এই মজুরি প্রদানের পূর্বে কিছু নীতিমালা মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ প্রণোদনামূলক মজুরি প্রদানের আগে এর কিছু নীতিমালা অনুসরণ করে ব্যবস্থা নিতে হবে, যা নিম্নরূপ :

(১) **নমনীয় :** প্রণোদনামূলক মজুরির অন্যতম একটি নীতি হলো নমনীয়তা। এই মজুরি যত নমনীয় হবে প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মীরা ততই কাজের প্রতি সন্তুষ্ট হবে।

(২) **যোগ্যতাভিত্তিক মজুরি প্রদান :** প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত কর্মীদের যোগ্যতা দেখে তারা কতটুকু মজুরি পাওয়ার যোগ্য সেই হিসেবে মজুরি প্রদান করতে হবে। অর্থাৎ ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা প্রণোদনামূলক মজুরির গুরুত্বপূর্ণ একটি নীতি।

(৩) **আইনসম্মত নীতিসমূহ :** প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থা চালু করার আগে এটি আইনের আওতায় আনতে হবে। আইনের নীতিমালা অনুসরণ করে এই মজুরি ব্যবস্থা পরিচালনা করতে হবে।

(৪) **আর্থিক অবস্থা :** প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অবস্থার উপর ভিত্তি করে প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। অর্থাৎ আর্থিক অবস্থা ভালো থাকলেই এই ব্যবস্থা চালু করা যাবে। তা না হলে প্রতিষ্ঠান ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

(৫) **উৎপাদন ভিত্তিতে মজুরি :** একটি প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন যত বেশি হবে মজুরিও তত বাড়বে। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের অধিক মুনাফা অর্জিত হবে এবং কর্মীদেরও মুনাফা বাড়বে। বলা যায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধির উপর ভিত্তি করেই মজুরি প্রদান করা হয়।

(৬) **সহজবোধ্যতা :** প্রণোদনামূলক মজুরি পদ্ধতির বিশেষ একটি নীতিমালা হলো পদ্ধতির সহজবোধ্যতা। অর্থাৎ, পদ্ধতিটি এমন হতে হবে যে, যাতে কর্মীগণ সহজেই তা বুঝতে পারে।

৭) **দুই পক্ষে সম্মতি :** প্রতিষ্ঠানের দুই পক্ষের সম্মতি অর্থাৎ মালিক ও শ্রমিক-কর্মীর গ্রহণযোগ্যতা থাকলে এই মজুরি ব্যবস্থা উন্নত হবে। কারণ যেকোনো এক পক্ষ যদি না মানে তবে সেই ব্যবসা টিকে থাকতে পারে না।

(৮) **একই নীতি অনুসরণ :** বিশ্বে সকল প্রতিষ্ঠানে মজুরির ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণ হচ্ছে কি না তা লক্ষ রাখতে হবে। একই নীতি থাকলে কর্মীরাও এতে সন্তুষ্টবোধ করে।

(৯) **মানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থা :** যেকোনো প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি উৎপাদন ব্যবস্থা মানসম্মত কি না তা খেয়াল রাখতে হবে। উৎপাদন ব্যবস্থা গুণগত হলেই উৎপাদন বৃদ্ধি হবে ও অধিক মুনাফা অর্জিত হবে।

(১০) **সুশৃঙ্খল কার্য পরিবেশ :** একটি প্রতিষ্ঠানের আয়-উন্নতি নির্ভর করে প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিবেশের ওপর। কার্য পরিবেশ যত সুশৃঙ্খল, উত্তম কর্মীরা কাজ করতেও ততটা আগ্রহী। তাই প্রণোদনামূলক মজুরি প্রদানের পূর্বে উত্তম কার্য পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সুতরাং বলা যায় যে, উপরোক্ত সকল নীতিমালা অনুসরণ করলে প্রণোদনামূলক মজুরি ব্যবস্থা উন্নতমানের হবে।

সারসংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মীদের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি পেলে তাদের মধ্যে আরো দক্ষতা বাড়ানোর জন্য যে অধিক হারে অতিরিক্ত মজুরি দেওয়া হয় তা হলো প্রণোদনামূলক মজুরি। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করা হলো এর প্রধান উদ্দেশ্য। ফলে শ্রমিকরা কাজের প্রতি আগ্রহী হবে এবং মালিকও সন্তুষ্ট হবে। তবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য অর্জনের পাশাপাশি এই মজুরি ব্যবস্থা চালু করার সময় লক্ষ রাখতে হবে যে এর ফলে ব্যয় হ্রাস পাচ্ছে কি না। কারণ যদি আয় না হয় তবে এই মজুরি ব্যবস্থার ফলে আরও খরচ বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই সব দিক বিবেচনা করে প্রতিষ্ঠানে লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রণোদনামূলক মজুরি গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠ-২.৪ সাংগঠনিক কাঠামো
Organizational Structure

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- সাংগঠনিক কাঠামো বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাংগঠনিক কাঠামোর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সাংগঠনিক কাঠামার সংজ্ঞা
Definition of Organizational Structure

সাধারণত সাংগঠনিক কাঠামো বলতে বোঝানো হয় একটি প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ চিত্র বিশেষকে। অর্থাৎ একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে যতজন কর্মী আছে তাদের কাজ, দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি সকল বিষয় যে চিত্র বা নকশায় তৈরি করা হয় তাকে সাংগঠনিক কাঠামো বলে। এই চিত্রে কর্মীদের কাজ, দায়িত্ব, উদ্দেশ্য সবকিছু নিয়ম অনুসারে ভাগ করা থাকে। এর ফলে কর্মীরা প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয় সম্পর্কে পূর্বেই জানতে পারে এবং প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন সহজ হয়।

সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে নিম্নের সংজ্ঞাটি প্রণিধানযোগ্য।

Mary Coulter-এর ভাষায়, "যে কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক কাঠামো বা কর্তৃত্ব ও যোগাযোগ সিস্টেম বর্ণনা করা হয়, তাকে সাংগঠনিক কাঠামো বলে।"

Bartol and Martin বলেন, "প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন দল ও কর্মীদের কাজের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং সমন্বয় সাধন করার প্রক্রিয়াই হলো সাংগঠনিক কাঠামো।"

সুতরাং বলা যায় যে, সাংগঠনিক কাঠামো হলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগ, উপ-বিভাগ, কর্মী ও তাদের কাজের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রক্রিয়া। অর্থাৎ কোন কোন কর্মী কী কী দায়িত্ব নিবে, কী কাজ করবে, কতটুকু সম্পদ ব্যবহার করবে, কত সময়ে কার্য বাস্তবায়ন করবে, কার নিকট জবাবদিহি করবে ইত্যাদির একটি রূপরেখাই হলো সাংগঠনিক কাঠামো।

সাংগঠনিক কাঠামোর প্রকারভেদ
Types of Organizational Structure

সাংগঠনিক কাঠামো বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিম্নে সাংগঠনিক কাঠামোর প্রকারভেদ আলোচনা করা হলো :

১। **পিরামিড আকৃতির কাঠামো (Pyramidal Structure) :** যে সংগঠন কাঠামোর আকৃতি পিরামিডের ন্যায় তাকে পিরামিড আকৃতির সংগঠন কাঠামো বলে। এ কাঠামো এমনভাবে বিন্যস্ত, যা সহজেই বোঝা যায়।

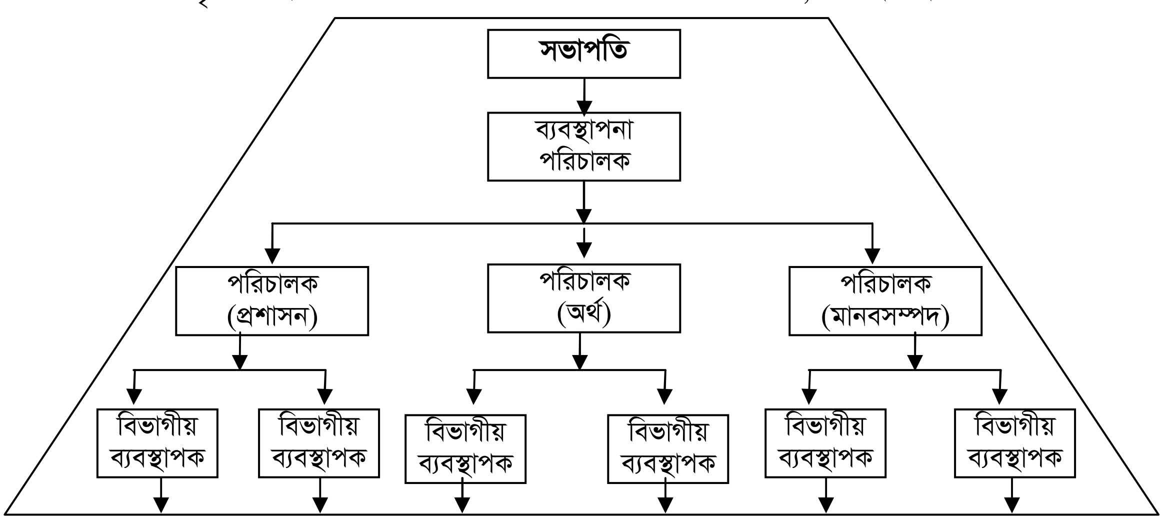

চিত্র : পিরামিড আকৃতির সংগঠন কাঠামো

২। **সমান্তরাল সংগঠন কাঠামো (Horizontal Organizational Structure) :** যে সংগঠন কাঠামোয় কর্মীদের মর্যাদা সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয় তাকে সমান্তরাল সংগঠন কাঠামো বলে। এই কাঠামো বেশ সহজ ও সরল প্রকৃতির।

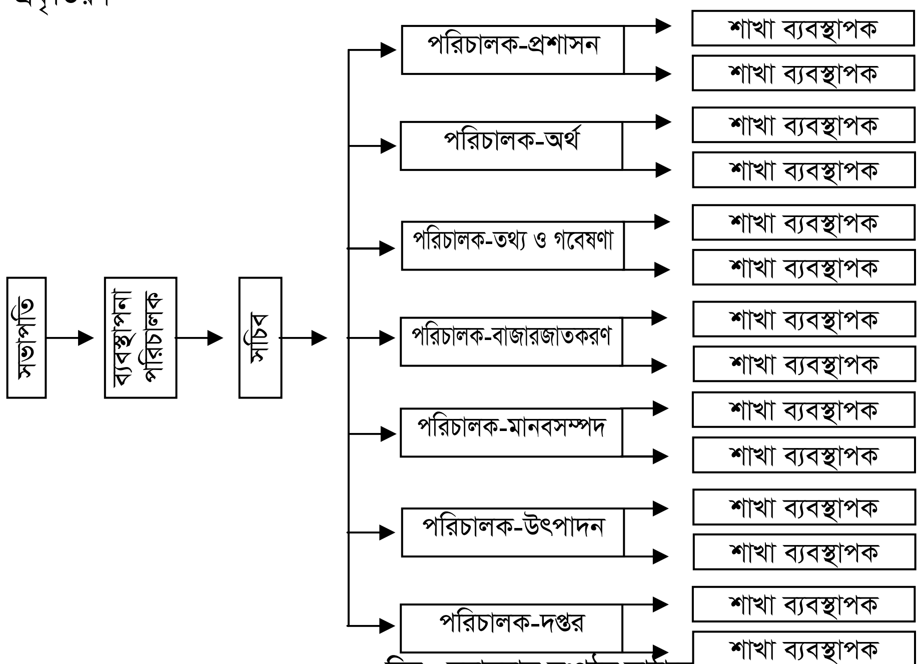

চিত্র : সমান্তরাল সংগঠন কাঠামো

৩। **উলম্ব সংগঠন কাঠামো (Vertical Organizational Structure) :** যে সংগঠন কাঠামোয় ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মীদের পদমর্যাদাক্রম অনুসারে উপর-নিচ বিন্যস্ত করে প্রদর্শন করা হয় তাকে উলম্ব সংগঠন কাঠামো বলে। এ সংগঠন কাঠামোয় ঊর্ধ্বতন ও অধস্তনদের মর্যাদা সহজেই বোঝা যায়।

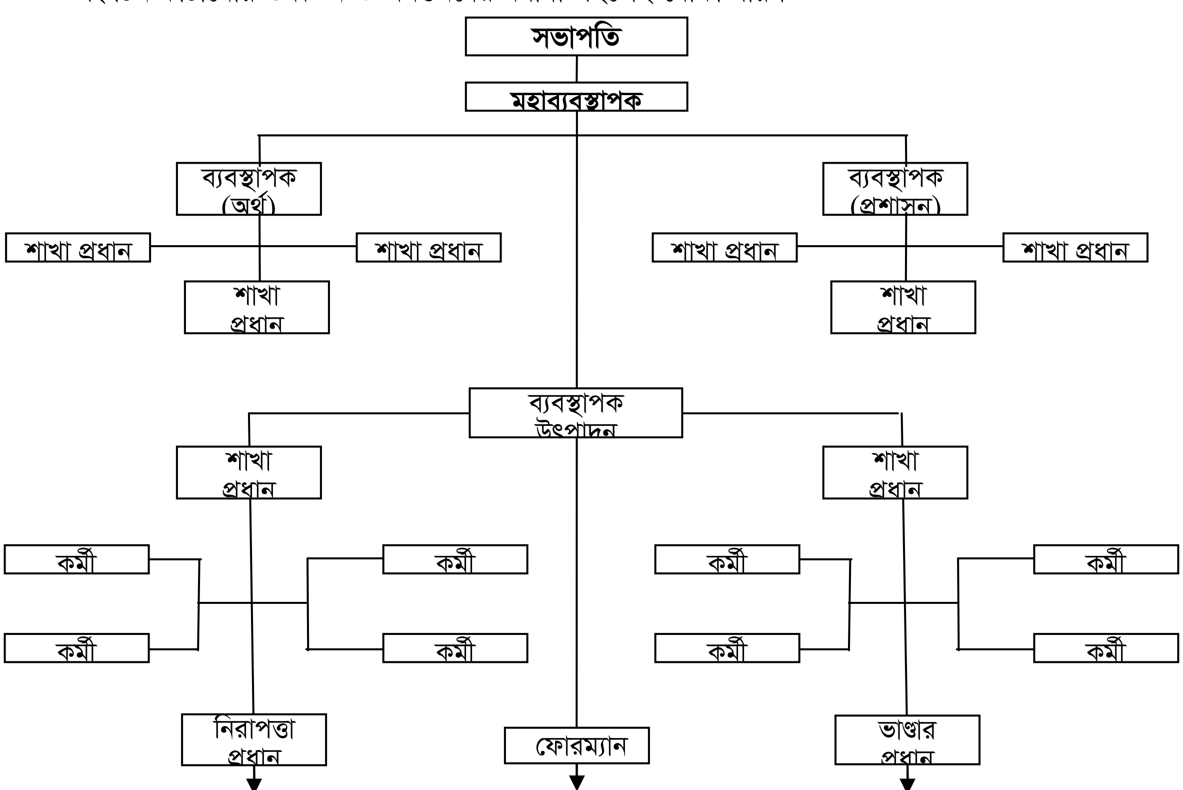

চিত্র : উলম্ব সংগঠন কাঠামো

৪। **বৃত্তাকার সংগঠন কাঠামো (Circular Organizational Structure) :** যে সংগঠন কাঠামোতে কর্মকর্তা ও কর্মীদের বিন্যাস বৃত্তাকার তাকে বৃত্তাকার সংগঠন কাঠামো বলে। এক্ষেত্রে সমজাতীয় পদমর্যাদা বৃত্তে সমান দূরত্বে থাকে।

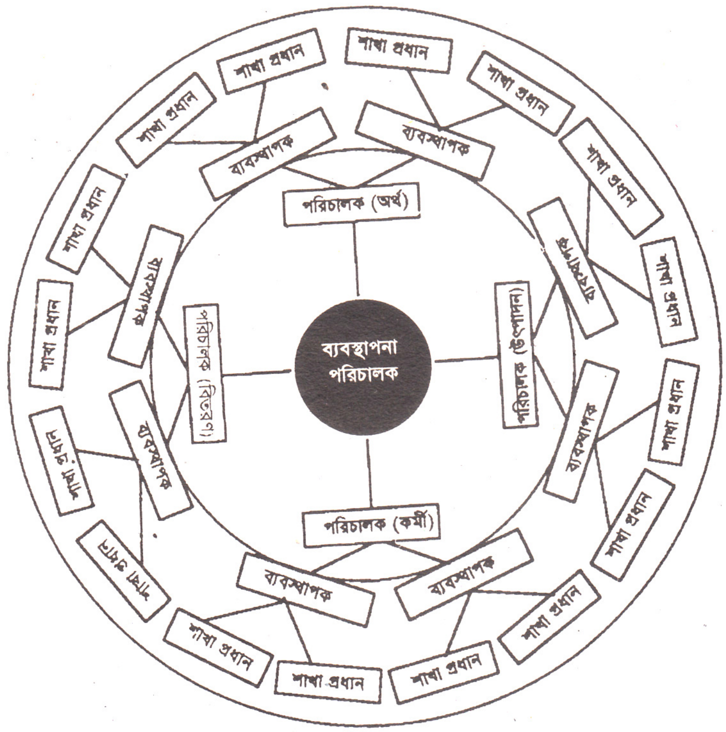

চিত্র : বৃত্তাকার সংগঠন কাঠামো

সারসংক্ষেপ

একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ কীভাবে ভাগ করা হবে, সম্পদসমূহ কীভাবে বণ্টিন হবে, বিভাগসমূহ কীভাবে সমন্বয় করা হবে তা নির্ধারণ করা হলো সাংগঠনিক কাঠামো। এর ফলে কর্মীদের কাজের পদ্ধতি, নির্বাহীদের কর্তৃত্ব ইত্যাদি একটি চিত্রে তুলে ধরা হয়। এতে কাজ করতে সহজতর হয়।

পাঠ-২.৫ ক্ষতিপূরণ আইনসমূহ
Compensation Legislation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- ক্ষতিপূরণ আইনসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ক্ষতিপূরণ আইনসমূহ
Compensation Legislation

যে আইন বা আইনের ধারাবলে শিল্পে কর্মরত শ্রমিক বা কর্মীদের বেতন বা, মজুরিসংক্রান্ত ন্যায্য ও যুক্তিসঙ্গত বিধি-বিধান প্রণীত হয়, তাই ক্ষতিপূরণ আইন (Compensation Legislation) নামে অভিহিত হয়। বাংলাদেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের ক্ষতিপূরণ আইন এক নয়। বাংলাদেশের শ্রম আইন (২০০৬)-এর ৮৬, ১৫০, ১৫১ ও ১৬১ ধারায় ক্ষতিপূরণ আইনটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশে শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ আইনটি বর্ণনা করা হলো:

১। বিপজ্জনক ভবন এবং যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে তথ্য প্রদান (ধারা-৮৬) [Sec-86 : Information about dangerous building and machinery] :

(১) যে ক্ষেত্রে কোন প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক দেখিতে পান যে, উহার কোন ভবন বা যন্ত্রপাতি, যাহা শ্রমিকেরা সাধারণতঃ ব্যবহার করেন এমন বিপজ্জনক অবস্থায় আছে যে, উহা যে কোন সময় কোন শ্রমিকের শারীরিক জখম প্রাপ্তির কারণ হইতে পারে, সে ক্ষেত্রে তিনি অবিলম্বে তৎসম্পর্কে লিখিতভাবে মালিককে অবহিত করিবেন।

(২) উক্তরূপ সংবাদ প্রাপ্তির পর মালিক যদি তিন দিনের মধ্যে তৎসম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন এবং উক্ত ভবন বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করার কারণে কোন শ্রমিক যদি জখম প্রাপ্ত হন তাহা হইলে মালিক, অনরূপ জখমপ্রাপ্ত শ্রমিককে, দ্বাদশ অধ্যায়ের অধীন উক্তরূপ জখমের জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের দ্বিগুণ হারে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকিবেন।

২। শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ প্রদানে মালিকের দায়িত (ধারা-১৫০) [Sec.- 150; Nonobligatory Aspects for Labour Compensation]:

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৫০(২) ও ১৫০(৭) ধারায় যে সকল আহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণ প্রদানে মালিক বাধ্য নয় সে সকল বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো–

(২) কোন মালিক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকবেন না, যদি–

(ক) জখমের ফলে তিন দিনের বেশী সময় কোন শ্রমিক সম্পূর্ণ বা আংশিক কর্মক্ষমতা না হারান;

(খ) জখমের ফলে মারা যান নাই এরূপ কোন শ্রমিকের দুর্ঘটনায় জখম প্রাপ্ত হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণ ছিল–

(১) দুর্ঘটনার সময় শ্রমিকের মদ্যপান বা মাদক দ্রব্য সেবনের ফলে প্রভাবাধীন থাকা;

(২) শ্রমিকগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রণীত বিধি বা সুস্পষ্ট আদেশ শ্রমিক কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে অমান্য করা;

(৩) শ্রমিকগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে তা জানা সত্ত্বেও শ্রমিক কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে কোন আঘাত নিরোধক নিরাপত্তা সরঞ্জাম বা অন্য কোন কৌশল অপসাধরণ করা বা উপেক্ষা করা [১৫০(২) ধারা]।

(৭) কোন আদালতে উক্ত জখম সম্পর্কে শ্রমিক কর্তৃক কোন ক্ষতিপূরণ মামলা দায়ের করা যাবে না, যদি–

(ক) তিনি শ্রম আদালতে উক্ত জখমের জন্য ক্ষতিপূরণের দাবী করে দরখাস্ত পেশ করে থাকেন; অথবা

(খ) তার এবং তার মালিকের মধ্যে দুর্ঘটনাজনিত কারণে জখমের জন্য ক্ষতিপূরণ আইনের বিধান অনুযায়ী উক্ত জখম সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য কোন চুক্তি হয়ে থাকে [১৫০(৭) ধারা]।

৩। **ক্ষতিপূরণের পরিমাণ (ধারা-১৫১) : এই ধারার বর্ণিত বিধিবিধানসমূহ হলো :**

(i) প্রতিষ্ঠানে বেতন ও মজুরির পরিমাণ হবে–

(ক) জখমের ফলে যদি কর্মীর মৃত্যু হয় তাহলে পঞ্চম তফসিলের দ্বিতীয় কলামে যে অর্থের পরিমাণ বলা হয়েছে;

(খ) জখমের ফলে যদি স্থায়ী অক্ষমতা ঘটে। তাহলে–

* যদি কর্মীটি প্রাপ্তবয়স্ক হন তাহলে ৫ম তফসিলের ৩য় কলামে যে অর্থের পরিমাণ বলা আছে সেই পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে হবে।

(ii) শ্রমিকটি অপ্রাপ্ত বয়স্ক হলে দশ হাজার টাকা প্রাপ্ত হবেন;

(গ) যদি স্থায়ী আংশিক অক্ষমতা ঘটে, তাহলে–

* কর্মীর জখমটি ১ম তফসিলে বর্ণিত হলে, স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার ক্ষেত্রে প্রদেয় ক্ষতিপূরণের শতকরা হার যা তফসিলে উল্লেখিত উক্ত জখমের কারণে উপার্জন ক্ষমতাহানির শতকরা হারের সমান;
* শ্রমিকের জখমটি ১ম তফসিলে বর্ণিত না হলে স্থায়ী সম্পূর্ণ অক্ষমতার জন্য প্রদেয় ক্ষতিপূরণের শতকরা হার যা উক্ত শ্রমিকের জখমের কারণে স্থায়ীভাবে উপার্জন ক্ষমতাহানির অনুপাতের সমান;

(ঘ) কর্মীর জখমের ফলে সম্পূর্ণ বা আংশিক অস্থায়ী অক্ষমতা ঘটে তাহলে মাসিক ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হবেন। অক্ষমতার তারিখ হতে চার দিন অতিবাহিত হবার পর যে মাসে প্রদেয় হবে উহার পরবর্তী মাসের প্রথম দিনে তা প্রদেয় হবে।

৪। **চুক্তির ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ (ধারা-১৬১) এ ধারায় বর্ণিত বিষয়সমূহ হলো :**

(i) মালিকপক্ষ কোন কাজের জন্য যদি “ঠিকাদার” নিযুক্ত করেন সেক্ষেত্রে তার দ্বারা নিযুক্ত কর্মী ক্ষতিপূরণ পাবেন এবং ঠিকাদার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মীও ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হবেন।

(ii) কোন মালিকপক্ষ এই ধারার অধীন কোন বেতন ও মজুরি প্রদানে বাধ্য হন সেক্ষেত্রে কর্মী যদি ঠিকাদারের বা কোন ব্যক্তির নিকট হতে ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারতেন সেক্ষেত্রে উক্ত মালিকপক্ষ ঠিকাদারের নিকট হতে ক্ষতিপূরণ পেতে অধিকারী হবেন। এইরূপ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ চুক্তির অবর্তমানে শ্রম আদালত নিষ্পত্তি করবে।

(iii) কর্মী কর্তৃক আদায়কৃত ক্ষতিপূরণ মালিকের পরিবর্তে ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা বোঝাবে না।

পরিশেষে বলা যায় যে, ২০০৬ সালের বাংলাদেশে শিল্প আইন অনুযায়ী এটিই কর্মীদের মজুরি ও বেতন প্রাপ্তির বিবরণসমূহ।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মীর বেতন ও মজুরি নির্ধারণে আইন প্রণীত হয়েছে। একইভাবে বাংলাদেশে শ্রমিক-কর্মীর মজুরি ও বেতন নির্ধারণে আইন বিদ্যমান আছে। ২০০৬ সালের শিল্প আইন অনুযায়ী এদেশের কর্মীদের ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করা হয়।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১। ক্ষতিপূরণ কর্মসূচির সংজ্ঞা দিন। বেতন ও মজুরির পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

২। বেতন ও মজুরির হার নির্ধারণ কৌশল ব্যাখ্যা করুন।

৩। ক্রান্তিকালীন বিশ্ব ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

৪। ক্ষতিপূরণের অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহ আলোচনা করুন।

৫। প্রণোদনামূলক মজুরির সংজ্ঞা দিন। এর উদ্দেশ্য ও বিবেচ্য বিষয় বর্ণনা করুন।

৬। প্রণোদনামূলক মজুরির বিবেচ্য শর্ত ও নীতিমালা আলোচনা করুন।

৭। সাংগঠনিক কাঠামোর সংজ্ঞা দিন। এর প্রকারভেদ আলোচনা করুন।

৮। ক্ষতিপূরণ আইনসমূহ ব্যাখ্যা করুন।